বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র্য

স্বপন আদনান

বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারায় ভূমগ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্র, বিভিন্ন দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতাবান বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরের শক্তি ও সমর্থন নিয়ে কৃষিজমি, খাসজমি, নদী, জলাশয়, খাল, খেলার মাঠ, বন, পাহাড় গ্রাস করছে। এর মাধ্যমে সর্বজনের জমি বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার বিবরণের সাথে সাথে ভূমিগ্রাসের রকমফের ও তার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে লেখা এই প্রবন্ধ।

১। ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

বাংলাদেশে বহুকাল ধরেই ভূমি দখল ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলে আসছে বিভিন্ন কায়দায়। লাঠিয়াল বাহিনীর জোর খাটিয়ে চর দখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার রাষ্ট্রীয় শক্তি খাটিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ করেছে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার দায়ে কৃষকের বন্ধক রাখা জমি মহাজনের হাতে চলে যাওয়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক।

ভূমি গ্রাসের এসব প্রচলিত পদ্ধতির সাথে আরও নতুন কিছু কলাকৌশল যোগ হয়েছে সাম্প্রতিক কালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের (neoliberal globalization) প্রভাব বাড়তে শুরু করার পর থেকে জমির দাম এবং ভূমি-ব্যবহারের (land use)উদ্দেশ্যেও বেশ কিছু গুণগত (qualitative) পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার ওপর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (structural adjustment) কর্মসূচির বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা শুরু করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund), বিশ্বব্যাংক, এবং অন্যান্য বিদেশী দাতা সংস্থা (সোবহান ২০০৭: ৩৩২-৩৩৩; আদনান ২০১৩: ১০৫)। এর ফলে যেসব নয়াউদারবাদী নীতির প্রবর্তন ঘটে তার মধ্যে ছিলো বাণিজ্য উদারীকরণ (liberalization), অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের বিধি-নিষেধ ক্রমশ: শিথিল করা (dergulation), এবং সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থা যতোদূর সম্ভব ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা (privatization)।

অর্থব্যবস্থার পরিচালনায় এসব পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাসমূহ রপ্তানিমুখী (export-oriented) বাণিজ্যিক উৎপাদন বাড়ানোর দিকে জোর দেয়। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় জমি ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করার জন্য এবং জনসাধারণের বসতবাড়ি ও জমিজমা বাণিজ্যিক খামারে বা শিল্পাঞ্চলে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সরকারি কর্মসূচি নেয়া হয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ভূমি ব্যবহারে এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান বসতি বা কৃষি জমি ক্রমশ: বাণিজ্যিক এলাকায় রূপান্তরিত হতে থাকে। এ কারণে ভূমির বাজার দাম বেড়ে যায় এবং জমিজমা একটি মূল্যবান বাজারী পণ্যে রূপান্তরিত হয়। ফলত: ভূসম্পত্তি (real estate) কেনাবেচার দালালী (brokering) ও ফটকাবাজী (speculation) বেশ লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয় (ওয়াকার ২০০৮; লেভিয়েন ২০১২)।

এই বিশ্ববাজারমুখী ও নয়াউদারবাদী নীতি পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র ভূমির ব্যবহার নয়, ভূমি দখলের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলেও কিছু অভিনব পদ্ধতি সংযুক্ত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে তাই নতুন ও পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতি উভয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পটভূমিতে কয়েকটি বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন উঠে আসে যেগুলো এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই:

১. সমকালীন বাংলাদেশে যে বিভিন্ন রকমের ভূমি গ্রাস প্রক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো কি একটা বিশ্লেষণের ছকে সাজানো সম্ভব?

২.বিশেষ করে, ভূমি গ্রাসের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা কি অপরিহার্য? নাকি, বলপ্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য পন্থায় এই একই লক্ষ্য হাসিল করা সম্ভব?

৩.সরাসরি ভূমি গ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াও অন্য ধরনের প্রয়াসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কি পরোক্ষভাবে জমি হস্তান্তর ঘটতে পারে?

৪.এ সকল ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় কোন কোন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বা শক্তি অংশ নেয়? তাদের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিতে কিরকম প্রকারভেদ আছে ?

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য সমকালীন বাংলাদেশে ভূমি গ্রাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত নীচের আলোচনায় দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরবো। এভাবে যে প্রাথমিক বিশ্লেষণ দাঁড় করানো যাবে তার ভিত্তিতে আরও বিস্তারিত বিবরণমূলক (descriptive) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical) আলোচনা করা সম্ভব। অবশ্য, এই প্রবন্ধে সকল প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিক বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তবে, সেগুলো অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি যাতে আলোচনার সামগ্রিক ব্যাপ্তি গোড়াতেই পাঠক বুঝে নিতে পারেন।

প্রথমত, ভূমিগ্রাসের পেছনে শ্রেণীগত সংঘাত ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বৈষম্য ও নীতি, সাম্প্রদায়িক (communal) বিদ্বেষ, এবং অপরাধীচক্রের (criminal) তৎপরতাও কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, যাদের জমি বেদখল হওয়ার আশংকা থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের দরকষাকষি (negotiations) কিংবা প্রতিরোধ (resistance) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিগ্রাস রুখবার চেষ্টা করতে পারে। সেজন্য জমি দখলের অন্তর্গত এবং আনুষঙ্গিক এসব জটিল ও বহুমাত্রিক (multi-dimensional) প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পরিণতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়গুলি পরবর্তী কোনো লেখায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার আশা রাখি।

তৃতীয়ত, তথ্য উপাত্তের (empirical) ভিত্তিতে আলোচনা করতে গেলেই তাত্ত্বিক কাঠামো (theoretical framework) এবং ধারণার (concept) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। রাজনৈতিক অর্থনীতির (political economy) চিন্তাধারায় ভূমিগ্রাস বা হস্তান্তরকে সাধারণত: মার্ক্সের (১৯৭৬: ৮৭৩-৮৯৫) 'আদি ধনার্জন' (primi-

tive accumulation) ধারণার আওতায় বিবেচনা করা হয়। তবে মার্ক্সের উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাভাবনাকে বর্তমানের নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের যুগের উপযোগী করার লক্ষ্যে হার্ভে (২০০৫: ১৪৪-১৬১) 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জনের' (accumulation by dispossession) ধারণাটি প্রস্তাব করেছেন। এছাড়া, মনে রাখা দরকার যে ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুধুমাত্র 'আদি ধনার্জন' নয়, পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। কাজেই কোনো একটি বিশেষ ভূমি দখলের ঘটনা কি ধরনের ধনার্জন প্রক্রিয়ার (accumulative process) আওতায় পড়বে তা ঠাহর করার জন্য তাত্ত্বিক কাঠামো ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ভূমি গ্রাস ও হস্তান্তরের তথ্যাবলীকে এখানে যে প্রাথমিক বিশ্লেষণের ছকে ফেলা হবে তা পরবর্তী কোনো লেখাতে উপরোক্ত তাত্ত্বিক ধারনার প্রেক্ষিতে আলোচনা করার আশা রাখি।

প্রবন্ধের বাকি অংশ কয়েকটা পরিচ্ছেদে (section) ভাগ করা হয়েছে। পরের (২ নং) পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার জন্য যেসব অনুমান ও ধারণার প্রয়োজন হবে সেগুলো সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের দখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের মধ্যে প্রকারভেদের (typology) একটা ছক (framework) উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পরের পরিচ্ছেদগুলোতে (৩,৪,৫ ও ৬ নং) এই প্রকারভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ভূমি গ্রাস পদ্ধতির কলাকৌশলগুলো বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে (৭ নং) পরিচ্ছেদে এই বিশ্লেষণের মূল সিদ্ধান্তগুলোকে জোড়া দিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যেসব বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে লেখার পরিকল্পনা রয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

২। আলোচনার ছক

ভূমি দখলের সংজ্ঞা

গোড়াতেই ভূমিগ্রাস নিয়ে আলোচনা করার জন্য যে ধারণাগুলো ব্যবহার করা প্রয়োজন সেগুলো পরিষ্কার করা দরকার।

কোনো এক পক্ষের জমি অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তরিত হবার প্রক্রিয়া প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঘটতে পারে; অথবা, আইনবহির্ভূত বা সহিংস কায়দাতেও হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তর আইনসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় ঘটে সেগুলোকে ভূমি 'দখল' বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর বিপরীতে, যেসব ক্ষেত্রে জমি জোর করে বা অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়, সেগুলোকে ভূমি 'বেদখল' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। জমি দখল এবং বেদখল উভয় ধরনের প্রক্রিয়াকে একসাথে নির্দেশ করার জন্য 'ভূমিগ্রাস' (land grabs) শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রসঙ্গে, ভূমিসম্পদ (asset) বলতে আবাদী জমি ছাড়াও বনভূমি, চারণভূমি, জনবসতি, জলাভূমি, ভূগর্ভস্থ পানি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এসব বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বেদখল হলে তাকে ভূমিগ্রাসের (land grab) ধারণার আওতায় আনা যাবে। যেসব বিশেষ ক্ষেত্রে (special case) পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে ভূমি গ্রাস করা হয় সেগুলোকে 'green grabs' বা 'প্রাকৃতিক দখল' বলা যেতে পারে (ফেয়ারহেড ও অন্যান্য ২০১২)।

সমকালীন বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই জমিজমার পাকাপোক্ত দালিলিক প্রমাণাদি থাকে না। তাছাড়া একই সাথে বিভিন্ন ধরনের ভূমি মালিকানার প্রচলনও রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, এজমালি, প্রথাগত (customary), সম্মিলিত বা সর্বজনের (common), প্রভৃতি নানা ধরনের জমি মালিকানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া, অনেক জমির রেকর্ড করা মালিকানা এক পক্ষের নামে থাকলেও বাস্তবে অন্য কোনো পক্ষ জায়গাটা দখল করে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন, অনেক সরকারি খাস জমি কার্যত: বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিবর্গের দখলে রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে দালিলিক অধিকারের বদলে সামাজিক ও প্রথাগত রীতি অথবা মৌখিক চুক্তি বা বোঝাপড়ার ভিত্তিতেও জমির নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হতে পারে। এসব বিভিন্ন কারণে জমি গ্রাসের সকল ঘটনা শুধুমাত্র মালিকানাসত্ত্ব (de jure ownership rights) বিবেচনা করলে বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দখলীসত্ত্বের (de facto possessory or occupancy rights) ক্ষেত্রেও ভূমিগ্রাস ঘটে। নীচের আলোচনায় জমির মালিকানাসত্ত্ব কিংবা দখলীসত্ত্বের যে কোনো একটার হস্তান্তর ঘটলেই সেটাকেই ভূমিগ্রাস হিসেবে গণ্য করা হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানকালে বহু ধরনের দেশি-বিদেশি এবং সরকারি ও বেসরকারি শক্তি ভূমিগ্রাসে অংশ নিয়েছে। সরকারি দখলদারদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী, উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি। অন্যদিকে, যেসব বেসরকারি (private evnon-state) শক্তি ভূমি গ্রাস করায় অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি কোম্পানি, কতিপয় বেসরকারি সংস্থা (NGO), তথাকথিত 'উন্নয়ন' প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণীর এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবান ব্যক্তিবর্গ, শাসক গোষ্ঠী (elites), ইত্যাদি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি প্রায় সর্বজনীন। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও প্রতিবেশী, পাড়া-পড়শী, বা সাধারন গ্রামবাসীর হাতেও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জায়গাজমি দখল হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের সতত: চলমান প্রক্রিয়াকে 'প্রাত্যহিক ভূমি গ্রাস' (everyday land grabs) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (ফেল্ডম্যান ২০১৬, ফেল্ডম্যান ও গাইসলার ২০১২: ৯৭১)।

ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের প্রকারভেদ

ভূমিগ্রাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ পড়লে অনেক রকমের কলাকৌশল ও প্রক্রিয়া চোখে পড়ে। এইসব বহুবিধ দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণের ছকে আনতে গেলে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার কয়েকটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সনাক্ত করা দরকার।

প্রথমত, দেখতে হবে যে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস করা হচ্ছে কি না। অনেক ক্ষেত্রে জবরদখল করার জন্য লাঠিয়াল বা মাস্তান বাহিনী ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে সহিংস (violent) শক্তিপ্রয়োগ বলা যায়। কিন্তু খোলাখুলি সহিংসতা ছাড়াও বল প্রয়োগ ঘটে যখন রাষ্ট্রীয় আইন ও সরকারি নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার হরণ করা হয়। অন্যদিকে, কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করেও ভূমিগ্রাস করার বাস্তব দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায়।

দ্বিতীয়ত, ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ (direct) বা পরোক্ষ (indirect) ভাবে ঘটতে পারে। যখন এক পক্ষ আরেক পক্ষের জমি সরাসরি নিয়ে নেয় সেটাকে প্রত্যক্ষ ভূমিগ্রাস বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ: লাঠিয়াল দিয়ে চর দখল করা। অথবা রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন করে জমিদার ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের ভূমি অধিকার বাতিল করে সেগুলো রাষ্ট্রের আওতায় নিয়ে আসা। এর বিপরীতে, এমন কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ভূমিগ্রাস নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর

কার্যকারণে (structure of causation) যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাতে শেষ পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠীর ভূমির অধিকার অন্য কারও হাতে চলে যেতে পারে। এ ধরনের অপরিকল্পিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরোক্ষ ভূমি গ্রাস বলা যায়। বাংলাদেশে এমন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় ধরনের ভূমি গ্রাস প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে সেগুলো নীচে আলোচনা করবো।

উপরন্তু, এই দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করলে চার ধরনের ভূমি গ্রাস প্রক্রিয়ার গুণগত প্রকারভেদের (typology) নিম্নোক্ত ছকটি দাঁড় করানো যায় (আদনান ২০১৬: ৭) :

সারণী ১: ভুমি দখলের কলাকৌশলের প্রকার ভেদ

বলপ্রয়োগ ও প্রক্রিয়ার ধরন	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বলপ্রয়োগ সহ	প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ সহ	পরোক্ষ বলপ্রয়োগ সহ
বলপ্রয়োগ ছাড়া	প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়া	পরোক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়া

আমরা এই ক্রমঅনুসারে এই চারটি ভূমি দখলের কলাকৌশল আলোচনা করবো:

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের ভূমিগ্রাসের অভিজ্ঞতায় এই চার ধরনের প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের নিদর্শন পাওয়া যায়। নীচের আলোচনায় বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভূমিগ্রাসের এসব বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবো।

এখানে উল্লেখ্য যে বল প্রয়োগ করে যেসব কায়দায় ভূমিগ্রাস করা হয়, সেগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হিসেবে পুনরায় ভাগ (sub-divide) করা সম্ভব। অনুরূপভাবে, শক্তি প্রয়োগ ছাড়া ভূমিগ্রাসের বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির ভিন্নতাও বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে দেওয়া যায়।

৩। প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস

প্রত্যক্ষভাবে শক্তি প্রয়োগ করাটাই সমকালীন বাংলাদেশে ভূমিগ্রাসের সবচেয়ে বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। এই বলপ্রয়োগ কখনও সহিংস রূপ নেয় এবং কখনও হয় আইনী নিয়মচর্চার প্রণালীর (legal procedure) মাধ্যমে। এ রকম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস করার পদ্ধতি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা উভয়েই ব্যবহার করে থাকে।

এর মধ্যে প্রথমে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সচরাচর যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে প্রধান দু'টো হচ্ছে: অধিগ্রহণ (acquisition) এবং নিরাপত্তায়ন (securitization)।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের মানে হচ্ছে যে সরকার আইন ব্যবহার করে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জমি নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসতে পারে। সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা উভয়ের জন্যেই রাষ্ট্রের প্রশাসন এভাবে অধিগ্রহণ করে জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে।

এই কাজের জন্য বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন হচ্ছে ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ'। তাছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ-দমন (counter-insurgency) কর্মসূচির প্রেক্ষাপটে আরও কড়া একটা আইন ব্যবহার করা হয়: ১৯৫৮ সালের (ভূমি অধিগ্রহণ) রেগুলেশন ('Regulation')। এছাড়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির (CHT Regulation 1900) বিভিন্ন ধারাও এই অঞ্চলে ভূমি অধিকার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে (আদনান ও দস্তিদার, ২০১১)।[১]

এসব বিভিন্ন অধিগ্রহণ আইনের একটি মৌলিক নীতি (principle) হচ্ছে যে ভূমি সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বা এখতিয়ার (eminent domain) রয়েছে। এই ক্ষমতার বলে যে কোনো জমিজমার ওপর বিদ্যমান সকল অধিকারকে নাকচ করে দিয়ে রাষ্ট্র 'জনস্বার্থে' (public purpose) সেই এলাকা নিজের এখতিয়ারে নিয়ে আসতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যাদের জমি নেওয়া হয় রাষ্ট্র তাদের প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এবং ভূমি অধিগ্রহণ করার পর সেই জায়গা অন্য যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ম অনুযায়ী বন্টন (allot) করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রের হাতে রয়েছে।

অবশ্য, এসব আইনে যাদের জমি অধিগ্রহণ করে নেয়া হয় তাদের জন্য সীমিত ক্ষতিপূরণের (compensation), এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিকল্প জায়গায় আংশিক পুনর্বাসনের (rehabilitation) ব্যবস্থা থাকতে পারে। তবে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা থাকলেও সেটার বাস্তবায়নে কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকারি আইনে শুধুমাত্র যাদের মালিকানাসত্ত্বের (ownership rights) দলিল প্রমাণাদি আছে তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ফলে, যাদের শুধুমাত্র দখলীসত্ত্ব (possessory occupancy rights) আছে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকার করে না। এছাড়া, যাদের মালিকানা বা দখলী সত্ত্ব কোনোটাই নাই, কিন্তু যারা অধিগ্রহণকৃত জমি তাদের জীবিকার জন্য ব্যবহার করে (যেমন, গরু চরানো, মাছধরা বা কাঠখড় কুড়ানো) তাদেরকেও ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য বলে বিদ্যমান আইন বিবেচনা করে না। উপরন্তু, মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতে যাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া স্বীকৃত তাদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত দামের চেয়ে কম হারে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় কিংবা দুর্নীতির মারপ্যাঁচে ফেলে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় (আদনান এবং অন্যান্য ১৯৯২)।

সরকারি আইনে শুধুমাত্র যাদের মালিকানাস্বত্বের (ownership rights) দলিল প্রমাণাদি আছে তাদেরকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ফলে, যাদের শুধুমাত্র দখলীস্বত্ব (possessory occupancy rights) আছে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য বলে স্বীকার করে না।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে একটি হলো সরকারি সংস্থা ও বিভাগের প্রকল্প এবং কার্যক্রমের স্থাপনার জন্যে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সরকারের বন বিভাগ হচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহত্তম ভূমি দখলকারী সংস্থা। বিগত দশকগুলো একসাথে ধরলে পার্বত্য চট্টগ্রামেই বন বিভাগ ২ লক্ষ একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বেআইনীভাবে উৎখাত করে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৮-৫৬)। আইন ও সালিশ কেন্দ্র সহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে কক্সবাজার, বান্দরবান, পাবনা এবং নোয়াখালী জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমের জন্য ব্যাপক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ২০১৭; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। এটাও বেশ আশ্চর্য যে আইনের নির্দেশিত পদ্ধতি

অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ করার এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধিবদ্ধ নিয়ম থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সেটা মেনে চলে না (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৪৫-৬০)। এসব ভূমি গ্রাসের ক্ষেত্রে যেসব সরকারি সংস্থাগুলোর আইন রক্ষা করার কথা তারাই বরং রক্ষকের ভূমিকা পালন না করে বরং রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণের একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের 'বিশেষায়িত' (specialized) অর্থনৈতিক অঞ্চল বা জোন (Zone) স্থাপনের জন্য নির্ধারিত এলাকা দখল করা বা কিনে ফেলা। এই অঞ্চলগুলি সরকারি অথবা বেসরকারি মালিকানায় ও উদ্যোগে স্থাপিত হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone or SEZ), রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (Export Processing Zone or EPZ), চিংড়ি মহাল (Shrimp Zone), ইত্যাদি।

মূলত: ১৯৮০র দশক থেকে বাংলাদেশে এ ধরনের বিশেষায়িত অঞ্চলের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ শুরু হয় (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১০)। ইদানিং পর্যায়ক্রমে দেশে ১০০টা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্রেরা। ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বেসরকারি (প্রাইভেট) উদ্যোগে গোটা দশেক বিশেষায়িত অঞ্চল গঠনের ঘোষণা পাওয়া যায় (প্রথম আলো; ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এই বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে পুঁজি খাটানো উৎসাহিত করার জন্য সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আয়কর থেকে সাময়িক রেয়াতসহ নানা ধরনের সুবিধা (concessions) ও প্রণোদনা (incentives) দিয়ে যাচ্ছে (মির্জা ২০১৫: ৫৩)। তাছাড়া, অঞ্চলগুলির (জোনের) সীমানার মধ্যে নানাবিধ বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা স্থাপনের পর যে বাড়তি জায়গাজমি থাকবে সেগুলোতে 'জোন' কর্তৃপক্ষ ও ডেভেলপাররা (developer) বিত্তশালীদের জীবনযাত্রার (life-style) সাথে মানানসই নানাবিধ সুবিধা ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। যেমন: অভিজাত আবাসিক এলাকা, শপিং মল বা সুপার মার্কেট, বিলাসবহুল হোটেল, পর্যটন কেন্দ্র, গল্ফ (golf) ও অন্যান্য ক্লাব, প্রাইভেট হাসপাতাল এবং স্কুল, কলেজ ইত্যাদি (সংবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; প্রথম আলো, ২৮ জুলাই, ২০১৬)।

এ ধরনের ভূমি ব্যবহার (land use) বৃদ্ধি পেলে এই বিশেষ অঞ্চলগুলোর ভেতরে এবং চারপাশে বাণিজ্যিক ভূমি বেচাকেনা এবং ভূসম্পত্তি (real estate) নিয়ে ফটকাবাজী (financial speculation) ক্রমশ: উৎসাহিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২০০৩ সালে নোয়াখালীতে চিংড়ী মহাল (Shrimp Zone) ঘোষণার পর বেদখলকৃত জমির একাংশ সম্ভাব্য রিয়াল এস্টেট কেনাবেচা এবং ফটকাবাজীর মুনাফার আশায় ফেলে রাখতে দেখা যায় (আদনান ২০১৩: ১২০-১২২)। ভারতেও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধিগ্রহণ করা ভূমিতে উচ্চবিত্তের আবাসন নির্মাণ ও লগ্নী পুঁজির ফটকাবাজীর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় (সাম্পাত ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮৮-৫৮৯; লেভিয়েন ২০১২: ৯৩৪; আদনান ২০১৪: ২৯)।

সরকারি সংস্থা ছাড়াও প্রাইভেট কোম্পানী ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার জন্যেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র জমি অধিগ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সরকার প্রথমে তার সর্বোচ্চ এখতিয়ার (eminent domain) ব্যবহার করে এবং জনস্বার্থের (public interest) কথা বলে সাধারণ মানুষের জমি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীতে, রাষ্ট্র সেই জমি কোনো বাণিজ্যিক বা প্রাইভেট সংস্থাকে চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করে বা ইজারা দেয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি প্রথমে স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। তারপরে সেই জমি বহুজাতিক কর্পোরেশন ইউনোকাল (Unocal)-কে লীজ (lease) দেয় প্রশাসন। পরবর্তীতে, ইউনোকোলের কাছ থেকে গ্যাসক্ষেত্রের এলাকাটি শেভ্রন (Chevron) নামের আরেকটি বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে চলে যায় (গার্ডনার ২০১২: ৮৭ ; গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

ভূমি অধিগ্রহণের আইনী প্রক্রিয়া ছাড়াও এই বহুজাতিক গ্যাস কোম্পানীকে নির্বিবাদে জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য তদানীন্তন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাবাসী মানুষের ওপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। বিবিয়ানার গ্যাসক্ষেত্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর প্রতিবাদ মিছিল (protest demonstrations) এবং রাস্তা বন্ধ (road blockade) কর্মসূচিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে কঠোর ভাবে দমন করা হয় (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬: ৫)। সে সময়কার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও তার নেতাকর্মীবৃন্দ এবং সিলেটের জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এলাকার অধিবাসীদের ওপর প্রবল চাপ দেয় যাতে গ্যাসক্ষেত্রের ভূমি অধিগ্রহণ এবং প্রজেক্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধের (resistance) কারণে আটকে না যায়।

এ ধরনের ভূমি ব্যবহার (land use) বৃদ্ধি পেলে এই বিশেষ অঞ্চলগুলোর ভেতরে এবং চারপাশে বাণিজ্যিক ভূমি বেচাকেনা এবং ভূসম্পত্তি (real estate) নিয়ে ফটকাবাজী (financial speculation) ক্রমশ: উৎসাহিত হবে।

আরেকটি ভূমিগ্রাসের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে একটি উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য রাষ্ট্র জমি অধিগ্রহণ করে এবং তা এশিয়া এনার্জী নামের একটি ভুঁইফোড় বিদেশি কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর করে (মুহাম্মদ ২০১৬: ৩২-৩৩; নূরে মওলা ২০১৬: ২-৩)। এই উন্মুক্ত কয়লাখনির জন্য যে এলাকা বেদখল করা হয় তা ছিলো তিনফসলা আবাদী জমি। এবং এই খনির জন্য যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গা অধিগ্রহণ করা হয়। এসব কারণে ফুলবাড়ীতে কয়লাখনি স্থাপন এবং জমি বেদখলের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য সরকার ও প্রশাসন সহিংস পুলিশী নির্যাতন চালায়, যার ফলে প্রতিবাদী মানুষের মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে (মুহাম্মদ ২০১৬; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

এখানে উল্লেখ্য যে এভাবে বেসরকারি সংস্থা ও কোম্পানীর জন্য 'জনস্বার্থের' (public purpose) দোহাই দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করে তা পরবর্তীতে প্রাইভেট মুনাফা অর্জনের জন্য হস্তান্তর করায় রাষ্ট্রের ভূমিকা জনসাধারণের কাছে অন্যায্য ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে (মির্জা ২০১৫: ৫৩)। এসব ক্ষেত্রে, নয়াউদারবাদী রাষ্ট্রকেই প্রাইভেট কোম্পানির জন্য জমির দালালের (broker) ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায় (ভাদুড়ী ২০০৮; ওয়াকার ২০০৮: ৫৮০; লেভিয়েন ২০১২:

৯৪১-৯৪৫; আদনান ২০১৩: ১১৭; ২০১৪: ২৯)।

বস্তুত:, 'জনস্বার্থের' দোহাই দিয়ে এলাকাবাসী মানুষের জমি ও জীবিকা কেড়ে নিয়ে সেই জায়গাগুলো পরবর্তীতে মুনাফাকামী প্রাইভেট কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নি:সন্দেহে অন্যায্য (unjust) এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রের ভূমি অধিগ্রহণের বৈধতা (legitimacy) প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্ষুণ্ন হয়েছে। জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের ভূমিগ্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ জন্মেছে তার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে তাদের প্রতিরোধ (resistance) আন্দোলন গড়ে উঠতে পেরেছে (আদনান ২০০৪; ২০১৩; ২০১৪)।

নিরাপত্তায়নের নামে ভূমিগ্রাস

অধিগ্রহণ ছাড়াও যে পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যাপকভাবে ভূমি গ্রাস করেছে তা হচ্ছে নিরাপত্তায়ন (securitization) (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬)। বাংলাদেশের জনসমষ্টির মধ্যে যেসব সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর (ethnic group) দেশের প্রতি আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ জেগেছে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি নীতিনির্ধারকেরা মনে, তাদের জায়গাজমি নানা অছিলা বা অভিযোগে জব্দ করা হয়েছে। সরকারি নীতি ও আইনকানুন পরিবর্তন করে এবং প্রয়োজনমতো রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের নিরাপত্তায়নজনিত ভূমি গ্রাস পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র (nation-state) যেসব সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত বলে ভাবা হয়, সেই 'কল্পিত জাতিসত্ত্বার' (imagined community) ধারণা (এ্যান্ডারসন ২০০৬) থেকে বিযুক্ত (excluded) বা বিচ্ছিন্ন হওয়া কোনো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ হলে ক্ষমতাসীন দল বা সম্প্রদায় তাদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার (national security) জন্য হুমকিস্বরূপ বলে দাবী করতে পারে। এবং এই অজুহাতে তাদের জায়গাজমি আইনী কায়দায় বা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলা হয়। এসব ক্ষেত্রে, কোনো নির্দিষ্ট (টার্গেট) ধর্মীয় বা জাতিগত সম্প্রদায়কে ক্ষমতাসীনদের জাতি গঠনের ধারণা থেকে বিযুক্ত বা বহিষ্কার করে এ ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার সাফাই (justification) এবং বৈধতা (legitimacy) তৈরি করার চেষ্টা করা হয়।

'জনস্বার্থের' দোহাই দিয়ে এলাকাবাসী মানুষের জমি ও জীবিকা কেড়ে নিয়ে সেই জায়গাগুলো পরবর্তীতে মুনাফাকামী প্রাইভেট কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকা নি:সন্দেহে অন্যায্য (unjust) এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

এভাবে নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্র যেভাবে কোনো জনগোষ্ঠীর জমিজমা বাজেয়াপ্ত (confiscation) করতে পারে তা অধিগ্রহণ (acquisition) প্রক্রিয়া থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন, নীতি এবং শক্তিপ্রয়োগ ব্যবহার করে ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হলেও যাদের জমি নেয়া হয় তাদের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকে না। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে রাষ্ট্রের 'নিরাপত্তা' চাউনির সন্দেহবোধ দিয়ে পরিচালিত এ ধরনের ভূমি গ্রাস প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা যায়।[২]

১৯৬৫ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হয়। তারপর থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশের প্রতি আনুগাত্য প্রশ্ন করে তাদের ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের সরকারেরা 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত আইন ও অধ্যাদেশ (order) জারি করে হিন্দুদের সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় এখতিয়ারে নিয়ে আসে।[৩] এবং অনেকক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা প্রভাব খাটিয়ে তা দখল করে নেয়। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের আইন সংশোধন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জব্দ করা জমি ও সম্পদ তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া বা 'প্রত্যর্পণ' করার কিছু উদ্যোগ নেয়।[৪] কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো আজ পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি।

এসব ক্ষেত্রে 'শত্রু সম্পত্তি' বা 'অর্পিত সম্পত্তি' সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক (discriminatory) আইনসমূহকে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার 'পরিচ্ছন্ন আইনি কায়দা' হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার ব্যবহার করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)। এভাবে জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে দেশের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে কলমের খোঁচায় 'জাতির শত্রু' বানিয়ে রাষ্ট্র তাদের জমিজমা গ্রাস করার (প্রশ্নবিদ্ধ) 'যথার্থতাও' (justification) তৈরি করার চেষ্টা করেছে (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

নিরাপত্তায়নের (securitization) ধারণার মাধ্যমে ভূমিগ্রাসের ভিন্ন ধরনের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী আদিবাসীদের ক্ষেত্রে (খান ২০১৫: ২৫)। ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই পাহাড়ীরা তাদের নিজস্ব জাতিসত্ত্বা, আত্মপরিচিতি (ethnic identity), ও ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দেনদরবার ও দরকষাকষি (negotiation) করে আসছিলো (মোহসীন ১৯৯৭, আদনান ২০০৪)। কিন্তু এক পর্যায়ে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পাহাড়ীদের নেতৃত্বদানকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং শান্তি বাহিনী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টিতে সমগ্র পাহাড়ী আদিবাসীরা বাংলাদেশ 'জাতিরাষ্ট্রের' শত্রু হিসেবে পরিগণিত হয়। পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-দমন রণনীতি (counter-insurgency strategy) অবলম্বন করা হয় তার একটি বিশিষ্ট কৌশল ছিলো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পাহাড়ীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও জমিজমা থেকে উৎপাটিত করা। অনেক ক্ষেত্রেই যুদ্ধকালীন সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই এই ভূমিগ্রাস ঘটে। একাজে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলি অধিকৃত জায়গাজমির ওপর পাহাড়ীদের পূর্বতন (pre-existing) ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত (common) অধিকার (property rights) সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে (রায় ১৯৯৫; মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৬২-৬৪; আদনান ২০০৪: ৪৭-৫১)।

উপরন্তু, এই বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে উচ্ছেদকৃত পাহাড়ীদের পরিত্যক্ত জমিজমা জোর করেই পুনর্বন্টন করে দেয়া হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনকারী (in-migrating) বাঙালী বসতিস্থাপনকারী (settler) জনসমষ্টিকে, অথবা অনিবাসী (absentee) এবং শহরবাসী প্রভাবশালী মহলের (elites) মধ্যে এভাবে জমি বন্টন করার সময় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পাহাড়ীদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, হেডম্যান ও কারবারীদের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রায় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে (রায় ১৯৯৫; মোহসীন ১৯৯৭; আদনান ২০০৪; আদনান ও দস্তিদার ২০১১; খান ২০১৫)। এসব কলাকৌশল ব্যবহার

করে পাহাড়ীদের প্রথাগত জুমচাষ ও বনজসম্পদ সংগ্রহের এলাকাসমূহ পরিণত করা হয় বাঙালী সেটলারদের ঘরবাড়ি ও চাষবাসের জমিতে, কিংবা নগরবাসী প্রভাবশালীদের রাবার, কাঠ ও ফলমূলের বাগানে (plantation) (আদনান ২০০৪: ৪২-৪৩; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৭-৮১)। এভাবে বহিরাগত বাঙালীদের কাছে পাহাড়ীদের জায়গাজমি নির্বিঘ্নে হস্তান্তর করার জন্য তদানীন্তন সরকার তাদের অধিকার সম্বলিত আইনকানুন একতরফাভাবে বাতিল বা পরিবর্তন করে দেয়। বিশেষ করে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে (CHT Regulation of 1900) যথাক্রমে ১৯৭১ এবং ১৯৭৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী সরকারসমূহ মারাত্মকভাবে পরিবর্তন করে দেয়। তার ফলে বাঙালীদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে আগের কোনো আইনী রক্ষাকবচ আর কার্যকর থাকে নি (আদনান ২০০৪: ৪১)।

বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ

রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে ভূমি দখলের বিশ্লেষণের পর এখন বেসরকারি সংস্থা বা গোষ্ঠী কিভাবে নিজেরাই বলপ্রয়োগে ভূমি গ্রাস করে তা সনাক্ত করা দরকার। রাষ্ট্রবহির্ভূত ভূমিগ্রাসকারীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের কিছু ক্ষমতাবান শ্রেণী ও আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক, কোম্পানী ও কর্পোরেশন, 'বাণিজ্যিক এনজিও' (NGO), রাজনৈতিক প্রভাবশালীবৃন্দ, মাস্তান বাহিনী ও অপরাধীচক্র (criminal mafia) ইত্যাদি (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৮৮-৯৪; আদনান ২০১৩; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)। এসব ক্ষেত্রে দখলদারেরা সুবিধামতো পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতার ব্যবস্থা করতেও সিদ্ধহস্ত। এ ধরনের বেসরকারি ভূমি গ্রাসের ঘটনা বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই ঘটেছে। বড় বড় নদীর চর ভূমিতে এবং প্রত্যন্ত অববাহিকা অঞ্চলে লাঠিয়ালদের জোরে ভাগচাষীদের বসিয়ে নিরন্তর জমি দখল করা এদেশের ভূমি সংঘাতের পুরানো ইতিহাসের অংশ (ইটন ১৯৯৭: ২১১-২১২; আদনান ও মনসুর ১৯৭৭; ডে উইল্ড ২০১১; আদনান ২০১৩: ১০১)।

শক্তি প্রয়োগ করে বেসরকারিভাবে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ায় সাম্প্রতিক-কালে নতুন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ যোগ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে এদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা উর্পাজনের লক্ষ্যে নোনাজলের চিংড়ী উৎপাদনের জন্য সহিংস (violent) কায়দায় 'ঘের দখলের' প্রচলন ঘটেছে ১৯৮০ -এর দশক থেকে (আদনান ২০১৩: ১০৫-১১০; পাপরকী ও কন্স ২০১৪)। বিত্তবান ও প্রভাবশালী চিংড়ীঘের মালিকেরা মাস্তানবাহিনী দিয়ে জোর করে উপকূলীয় এলাকার বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পোল্ডার কেটে দিয়ে লবণপানি ঢুকিয়ে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে স্থানীয় চাষীদের মিষ্টিপানির ফসল উৎপাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন তারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের জমি চিংড়ী ঘেরের জন্য নামমাত্র খাজনায় (হাঁড়ির টাকায়) ক্ষমতাশালী ঘের মালিকদের কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একবার চিংড়ী ঘেরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে সেই জমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর কখনও আগের কৃষকদের হাতে ফিরে আসে না।

এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জলাভূমি (wetlands), হাওর, বাওড়, জলাশয়ের ভূমি গ্রাস করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকে চলমান (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮৪)। এ ধরনের জলাভূমি সাধারণত: রাষ্ট্রীয় মালিকানার খাসজমি হলেও এগুলো ব্যক্তিগত ইজারাতে নেওয়া কিংবা বেআইনী কায়দায় দখলিস্বত্ব (possession) স্থাপন করার জন্য প্রভাবশালী এবং ব্যবসায়ী মহল অত্যন্ত উদগ্রীব। এজন্য তারা প্রয়োজনমতো মাস্তান বাহিনী দিয়ে জলাভূমিসমূহ করায়ত্ত্ব করে। পুলিশ প্রশাসনকে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে তাদের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখার পদ্ধতিগুলোও এই প্রভাবশালীরা ভালো করেই জানে।

শুধু প্রত্যন্ত চরভূমি নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের নাকের ডগায় শহর অঞ্চলেও ভূমি বেদখলে সক্রিয় রয়েছে বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী। তথাকথিত 'উন্নয়নের' সাথে শহরের জমির দাম বাড়ছে। এবং আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ি, বিপণিবিতান ও 'শপিং মল' ইত্যাদিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করা কিংবা ফটকাবাজীর (speculation) মুনাফা পাবার প্রবণতাও বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলের জমি বেদখল করার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, সহিংসতা এবং খুনখারাবি ব্যবহৃত হচ্ছে (ফেল্ডম্যান ওগেইসলার ২০১২: ৯৮২-৯৮৫)। ঢাকা শহরে করাইল কিংবা আগারগাঁওয়ের মতো বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করে সেই জায়গাগুলো নতুন মার্কেট বা এ্যাপার্টমেন্টের জন্য বেদখল করার প্রচেষ্টাও এখন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওপরে আলোচিত দৃষ্টান্তগুলো মূলত: অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ দিয়ে পরিচালিত ভূমিগ্রাসের নমুনা। তবে, এগুলো ছাড়াও জাতি ও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ছত্রছায়াতেও ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় ভূমিগ্রাসের পাশাপাশি বিভিন্ন বাঙালী ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান পাহাড়ীদের ভূমি বেদখলে ব্যাপকভাবে সক্রিয়। তাদের মধ্যে প্রভাবশালী সেটলার, বাগান মালিক (plantation owners), অন্যান্য ক্ষমতাবান গোষ্ঠী এবং সরকারি কর্মকর্তারা নানাভাবে জোরজবরদস্তি করে পাহাড়ী আদিবাসীদের জায়গাজমি দখল করে নিচ্ছে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭১-৯৯)। এছাড়া, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূমি গ্রাস করেছে (বারকাত ও রায় ২০০৪: ২২৫-২৩১; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। অনুরূপভাবে, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলার স্থানীয় বাঙালীরা সশস্ত্র আক্রমণ এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মুন্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও এবং অন্যান্য জাতির আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল করার অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে (ডেইলি স্টার, ২১ জানুয়ারি ২০১৫)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে এ ধরনের বেসরকারি ভূমি বেদখল প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে সমাজের বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্রেণী এবং প্রধান (dominant) ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ। অর্থাৎ সমকালীন বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু (majority) বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতর থেকেই ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া প্রধানত: পরিচালিত হয়েছে। এটাও লক্ষণীয় যে ভূমিগ্রাসীদের আক্রমণ ও বলপ্রয়োগের সময় আক্রান্ত শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সরকার এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্র ও নিরাপত্তাবাহিনীর কাছ থেকে যথাযথ সুরক্ষা পায়নি অনেক ক্ষেত্রেই।

৪। পরোক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিগ্রাস

এপর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বলপ্রয়োগ প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা দেখবো কিভাবে শক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক লক্ষ্য অন্য কিছু হলেও তার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত মানুষ ভূমি হারাতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে ভূমি বেদখল শেষ পর্যন্ত শক্তি দিয়ে পরিচালিত হলেও সেই প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে (indirectly) কাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ:,

রাষ্ট্রীয় নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের ঘটনাপরম্পরায় কিংবা সম্প্রদায়িক সংঘাতের অঘোষিত (undeclared) পরিণতি হিসাবে এ ধরনের পরোক্ষ ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

এরকম একটি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় ১৯৯২ সনে যখন নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে বাংলাদেশ সরকার চিংড়ী মহাল বিধি (Shrimp Zone Rules) প্রবর্তন করে। ২০০৩ সালে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নোয়াখালি জেলায় চিংড়ী মহালের জন্য নির্ধারিত এলাকা স্থাপন ঘোষণা করে (আদনান ২০১৩: ১১৭-১২২)। লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রের উদ্যোগে সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য -অর্থাৎ রপ্তানিযোগ্য চিংড়ী উৎপাদন - বাস্তবে সফল হয়নি। কিন্তু চিংড়ী মহাল নীতিতে চিংড়ীচাষের খামারের জন্য উদ্যোক্তা শ্রেণীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারী খাস জমি লীজ দেবার ঘোষণা থাকার ফলে এর মাধ্যমে তাদের জন্য ভূমিগ্রাস করার একটি নতুন অনুমোদিত পথ খুলে যায়।

বস্তুত: বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠী এই সুযোগে চরাঞ্চলের বিস্তৃত জমিতে চিংড়ী ঘের স্থাপনের অছিলায় সেখানে বসবাসরত ভূমিহীন ও নদীশিকস্তী পরিবারদের উচ্ছেদ করে তাদের জায়গাজমি দখল করে (আদনান ২০১৩)। এভাবে একবার চরের জমির উপর দখল (*de facto* possession) স্থাপন করার পর তারা ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা ও প্রশাসনের যোগসাজশে সেসব জমির বানোয়াট দলিলপত্র তৈরী করে আইনী মালিকানাসত্ব (*de jure* ownership) জাহির করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ সবের পরিণতিতে চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাণিজ্যিক কৃষি খামার ও মাছ চাষের (agribusiness, agro-fisheries) জন্য অনেক বিশাল খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ভূমি দখলের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও ভূমিহীনেরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন দাঁড় করাতে চেষ্টা করে, তদানীন্তন সরকার পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে সেটাকেও দমন করে (আদনান ২০১৩ : ১০৫-১১৫)।

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসকল নয়া উদারবাদী নীতির দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে চিংড়ী মহাল স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় সেগুলোর জন্য সুপারিশ করেছিলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক (regulatory) প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থা (ওয়াকার ২০০৮: ৫৭৩-৫৭৪; আদনান ২০১৩: ১০৫-১০৬) এসব আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাকে নয়া উদারবাদী পথে পরিচালিত করা এবং চিংড়ী রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন বাড়ানো। কিন্তু তাদের এই নীতি বাস্তবায়নের সময় যে ব্যাপক ভূমি দখল ঘটে সেটা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না। সেজন্য চিংড়ী মহাল সৃষ্টি করার চেষ্টার ফলশ্রুতিতে যে ভূমিগ্রাস ঘটে তাকে একটি *পরোক্ষ* প্রতিক্রিয়া হিসাবে অভিহিত করা যায়।

শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরোক্ষ ভূমিগ্রাসের আরেকটি পন্থা হচ্ছে সামাজিকভাবে দুর্বল সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে আতংক ও অনিশ্চয়তা (insecurity) সৃষ্টি করা। এভাবে তাদেরকে নিজেদের জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করাই এই কৌশলের চূড়ান্ত লক্ষ্য (আদনান ও দস্তিদার ২০১১; আদনান ২০১৬ ক)।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের (Partition) সময় থেকে ধর্মীয় সংঘাত এবং দাঙ্গার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই তাদের জমিজমা ফেলে, কিংবা তা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অনুরূপ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছে। এর ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত (ethno-religious) সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাদের জায়গাজমি ছেড়ে ক্রমাগতভাবে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ধরনের সাম্প্রদায়িক শঙ্কা ও আতংক সৃষ্টি করার একটা প্রচলিত পন্থা হলো ভিন্নধর্মী মানুষের উপাসনালয় কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা করা। এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কক্সবাজার জেলার রামু ও উখিয়ায় ২০১২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকে পর্যায়ক্রমে কয়েক ডজন বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তিস্থাপনা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে কিংবা অন্যান্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঘটনায় (বড়ুয়া ২০১৩; আহমেদ ২০১৩: ৩৪০-৩৪৪)। এই ঘটনার পর আক্রান্ত এলাকার সমগ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিশ্চয়তা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। অনেক পরিবারই তাদের নিরাপত্তার খাতিরে নিজেদের পারিবারিক ভিটামাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান কিংবা চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন।

এভাবে ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করে ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার দৃষ্টান্ত আরও আগে থেকেই দেখা যায়। কয়েক বছর ধরে হুমকি দেয়ার পর ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাজেক ইউনিয়নে অবস্থিত বাঘাইহাটের নিকটবর্তী বৌদ্ধদের বনানী মৈত্রী বনবিহার জোর করে পুড়িয়ে দেয়া হয় (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৭৩-৭৪)। এই বৌদ্ধবিহার সংলগ্ন আশেপাশের জায়গাগুলো বাঙালী বসতিস্থাপনকারীরা (settlers) অনেক দিন থেকেই বেদখল করার চেষ্টা করছিলো। স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নাকের ডগাতেই এই আক্রমণ ঘটলেও বৌদ্ধমন্দিরটি রক্ষা করার জন্য কোন কার্যকর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বস্তুত: ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ সাম্প্রতিক কালে প্রায়ই ঘটছে। ২০১০ সালের ছয়মাস ধরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত আক্রমণের তথ্য বিশ্লেষণ করে গৌতম (২০১৫: ৭৫-৮২) একটা সমীক্ষা তৈরি করেছেন। তা থেকে জানা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমি গ্রাস করা হয়েছে।

সামাজিক আতংক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে ভূমিগ্রাস করার আরেকটি বহুল প্রচলিত পন্থা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে নারীদের ওপর যৌন হামলা ও হয়রানী করা। কোনো গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে নিশানা করে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণ করা হলে তাঁদের নিকট আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র সম্প্রদায়ই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের আতঙ্ক আরও ঘনীভূত হয় যদি সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি দেয়া না হয়, এবং তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিচারের আওতার বাইরে থেকে দিব্যি দায়মুক্তি উপভোগ করতে থাকে। নারীদের ওপর এ ধরনের শক্তি প্রয়োগের ঘটনা বর্তমান বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই ঘটছে, যার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়াও কাজ করে চলেছে (মোহসীন ১৯৯৭: ১৭৮; আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৯৬-৯৭; সর্বজনকথা ২০১৪: ৫-৬)।

যেসব নারীরা এ ধরনের যৌন হামলার শিকার, তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজেদের ইজ্জত বা মানসম্মান হারানোর আতঙ্ক ও আশঙ্কায় দিন কাটাতে হয় (সর্বজনকথা ২০১৪:৫-৬)। কোন এক পর্যায়ে তাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তাদের জমিজমা হামলাকারীসহ অন্যান্য প্রভাবশালীরাও বেদখল করতে পারে। ২০১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর

ওপর স্থানীয় বাঙালী দখলকারীদের আক্রমণ অনুরূপ একটি ঘটনা।

কোনো সম্প্রদায়ের জায়গাজমি দখল করার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর নানা ধরনের হামলা করা হলে সেটাকে বৈধতা দিয়ে সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে যাদের জমিজমা নিশানা (target) করা হয় সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ভূমিদখলকারীরা নানাভাবে নিজেদের থেকে ভিন্ন (other) কিংবা শত্রু (enemy) হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; ফেল্ডম্যান ২০১৬)। এ ধরনের 'ভিন্নকরণ' (othering) প্রক্রিয়া চালু এবং প্রচার করা হয় শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং মতাদর্শের বিকৃত ব্যবহার করে। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, কৃষ্টিগত, এবং অন্যান্য ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এই 'ভিন্নকরণ' ও 'শত্রু-উৎপাদন' প্রক্রিয়ার মালমসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৫। বল প্রয়োগ ছাড়াই প্রত্যক্ষ ভূমি দখল

এরপর দেখা যাক শক্তি প্রয়োগ না করেও কি কি ভাবে ভূমি দখল করা হয়েছে সমকালীন বাংলাদেশে। এ সব ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু শক্তিপ্রয়োগ করা হয় না, সেহেতু এই প্রক্রিয়াগুলো সাধারণতঃ এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে কোনো প্রকাশ্য বিরোধ না ঘটে। যারা ভূমি হারান তাদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা আপোষের মাধ্যমে, ভূমি দখল করা হয়। এই ধরনের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আলোচনা ও দরকষাকষির মাধ্যমে জমি কেনা, প্রলোভন দেখিয়ে জমি নেওয়া, ভূমির দলিলপত্র জাল করে বানোয়াট মালিকানা দাবী করা, ইত্যাদি।

বাজার থেকে ভূমি কেনা বা ভাড়া নেওয়া এ ধরনের একটি পন্থা। এরকম ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তির মালিকানা বা দখলীসত্ত্ব কেনা, অথবা শর্তসম্বলিত চুক্তির ভিত্তিতে জমি ভাড়া নেওয়া (lease)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাজারের মাধ্যম কেনার দাবী করেছে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশন, আবাসন কোম্পানী, ডেভেলেপার, ইত্যাদি (প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০১৬)।[৫] তাছাড়া নানা ধরনের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্যও জমি কেনার হিড়িক পড়েছে দেশের বিভিন্ন নগর ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং শিল্পাঞ্চলে। সুন্দরবনের চারপাশের রক্ষিত এলাকায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠানের জন্য আনুমানিক ১০ হাজার একর জমি কেনা হয়েছে (সর্বজনকথা ২০১৬: ৪)। এসব জমির ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাকর্মী এবং বিভিন্ন বাণিজ্য গোষ্ঠী (প্রথম আলো, ১৩ জুলাই ২০১৭)।

এ ছাড়া, দখলীসত্ত্বের (right of possession) কোন আইনসিদ্ধ স্বীকৃতি না থাকলেও বাস্তবে এ ধরনের স্বত্ব সক্রিয়ভাবে কেনাবেচা হয়ে থাকে। আইন বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দখলীস্বত্বের কেনাবেচার জন্য সক্রিয় ভূমি বাজার বিদ্যমান। নোয়াখালির চরাঞ্চলে ভূমিদস্যুরা তাদের করায়ত্ত্ব জমির দখলীসত্ত্ব বিক্রি করে থাকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থার কাছে (আদনান ২০১৩: ১১৬)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে সরকারি প্রশাসন থেকে বাঙালী সেটলারদেরকে 'আর-হোল্ডিং' (R-Holding) নামে যে কবুলিয়ৎ দলিল দেয়া হয়েছিলো সেগুলো তারা অনেকেই পরবর্তীতে বিক্রি করে দেয়। তারপর থেকে এই ভূমিস্বত্বের সনদগুলো (titles) অবাধে কেনাবেচা হওয়ার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন বম নেতা জুম লিয়ান আমলাই। (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ৬৫-৭০)। বিশেষ করে কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা, ব্যবসায়িক এনজিও (NGO) এবং ভূমি দখলদারেরা এই রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভূমিস্বত্বের সনদ কিনে নিয়েছে এবং পরবর্তীতে ভূসম্পত্তির ওপর মালিকানা দাবী করার জন্য সেসব দলিল অপব্যবহার করছে ব্যাপকভাবে।

সরাসরি বলপ্রয়োগ না করে ভূমি বেদখলের আরেকটি পন্থা হচ্ছে জমির দলিলপত্র ও রেকর্ড জাল করা কিংবা অবৈধভাবে বদলে দেয়া (বারকাত ও রায় ২০০৪: ১৯২-২২৪)। ভূমিগ্রাসীরা সাধারণতঃ প্রভাব খটিয়ে ও ঘুষ দিয়ে তহশিলদার, দলিল লেখক, এবং ভূমি অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের যোগসাজশে এ ধরনের জাল দলিলপত্র বানায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমির আসল মালিকদের অজান্তেই এমন জালিয়াতি ও প্রতারণা ঘটে থাকে। এরকম ভুয়া দলিলপত্র তৈরী করার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘবদ্ধ অপরাধীচক্র পরিচালিত ব্যবসা চালু আছে। ক্ষেত্রবিশেষে ভূমি অফিসে চাকুরীরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও এসব অপরাধচক্রে জড়িত থাকে। জাল ভূমিস্বত্ব কেনাবেচার ক্ষেত্রে এই সংঘবদ্ধ কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নোয়াখালী জেলা (আদনান ২০১৩: ১১৬) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (আদনান ও দস্তিদার ২০১১: ১০০-১০১)।

এমনকি, ঢাকা মহানগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে একটি অপরাধচক্র বিভিন্ন আবাসন কোম্পনির প্রতিনিধিদের নামে প্রায় ১৫০ একর জমি জালিয়াতি করে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছে। এমনটি সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী, ভূমির দালাল এবং দলিল লেখকদের যোগসাজশে (প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর ২০১২)। এছাড়া, গাজীপুর জেলারই শ্রীপুর উপজেলার তিনটি গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রায় হাজার খানেক একর জমি জালিয়াতি করে বেদখল করা হয়েছে চারটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামে। এই অবৈধ ভূমি দখল করা হয় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের ওপর প্রভাব খাটিয়ে এবং প্রয়োজনমত ঘুষ দিয়ে (আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য ২০১৪; সর্বজনকথা ২০১৫: ৭-৮)। অনুরূপ জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং জলনিয়ন্ত্রক অবকাঠামোর সরকারি জায়গাজমি প্রভাবশালীরা বেদখল করেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২: ৯৮২)।

কোনো বিরোধ ছাড়া নির্বিঘ্নে ভূমি দখল করার আর একটি চতুর কৌশল হচ্ছে জনমত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করা। এ জন্য 'দেশের ও জাতির উন্নয়নের জন্য ভূমি প্রদান করা দরকার' বলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে প্রচার করা হয় এবং ছলেবলেকৌশলে কোনো প্রতিরোধ করা থেকে তাঁদেরকে নিরস্ত করা হয়। দেশীবিদেশী উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কিংবা বেদখল করার সময় সাধারণ পাবলিকের মগজধোলাই করার জন্য এ ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পর এলাকাবাসীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়ার কলাকৌশলে। যদিও শেভরন (Chevron) নামের বহুজাতিক কোম্পানী মুনাফা বানানোর জন্যেই গ্যাস উত্তোলন করছে, তবু তারা বিবিয়ানার স্থানীয় মানুষকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে যে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের 'জাতীয় উন্নয়নের' জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু, এই ভূমি দখলের 'প্রতিদান' হিসাবে তারা এলাকাবাসীর জন্য কিছু স্কুল, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে, এবং সেগুলোকে 'উন্নয়নের উপহার' (development gift) হিসাবে এলাকাবাসী ও সাধারণ পাবলিকের

কাছে উপস্থাপন করে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৮; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৯; আহাসান ও গার্ডনার ২০১৬)।

এ ধরনের 'উপহারের রাজনীতির' (`politics of the gift') মাধ্যমে এই কোম্পানী তাদের ভূমি দখল কার্যক্রমকে বৈধতা (legitimcy) প্রদান করার চেষ্টা করেছে। উপরন্তু, এলাকাবাসীকে 'আধুনিকতা এবং উন্নয়নের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়ে' তাদেরকে গ্যাসক্ষেত্র প্রকল্পের বিরোধিতা না করে বরং সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

লক্ষণীয় যে, এসব কর্মকান্ড এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রচারণা জোরদার করার জন্যে শেভরন কতিপয় জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার (NGO) সাথে 'অংশীদারিত্বের' (partnership) চুক্তি সম্পাদন করে। এভাবে, নিজেদের কোম্পানীর ভাবমূর্তিটাকে 'উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সহায়তার মোড়কে মুড়ে' তারা নিজেদের কর্মকান্ডকে 'নতুনরকম ছাপ' (rebranding) দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ (public relations) ও বিজ্ঞাপন (advertising) প্রচারের মাধ্যমে শেভরন এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উন্নয়ন এবং 'জনসেবামূলক' কর্মকান্ডকে নিজেদের 'ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সামাজিক দায়বদ্ধতার' (corporate social responsibility or CSR) নির্দশন হিসেবে তাদের বিদেশী শেয়ার মালিক (Share holder) এবং বাংলাদেশী নীতিনির্ধারকদের কাছে দাবি করেছে (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৬-৭ ; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ৭-১০)।

এখানে এটাও লক্ষণীয় যে, শেভরন এলাকাবাসীকে যেসব সুবিধা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রদান করার মতো ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছা কোনোটাই তাদের ছিলো না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্থানীয় অধিবাসীদের পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ দেওয়া কিংবা এই এলাকায় কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা, কোনোটাই এই বিদেশী গ্যাস কোম্পানীর এখতিয়ারের মধ্যে নেই (গার্ডনার ও অন্যান্য ২০১৪: ৩)। তা সত্ত্বেও এসব মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে স্থানীয় মানুষের সম্ভাব্য প্রতিরোধ নিবৃত করে তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য এই বহুজাতিক কর্পোরেশন এ ধরনের সচেতন ও পরিকল্পিত প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেছিলো।

সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকারক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপনাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন ও সাজানো কথোপকথনের (talk show) কৌশলী ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

এইভাবে বিতর্কিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং তার জন্য ভূমিগ্রাসের সাফাই গেয়ে জনমতকে প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করার আরও দৃষ্টান্ত বর্তমানে বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুন্দরবনের জন্য ক্ষতিকারক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থাপনাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে টিভি ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিজ্ঞাপন ও সাজানো কথোপকথনের (talk show) কৌশলী ব্যবহার লক্ষ্যনীয়।

৬। বলপ্রয়োগ ছাড়া পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় ভূমি দখল

ভূমি দখলের এই বিশেষ প্রক্রিয়াটি সনাক্ত করা একটু কঠিন যেহেতু এসবক্ষেত্রে কেউ সরাসরি বলপ্রয়োগ করে না এবং জমি হারানোর ঘটনাগুলো ঘটে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিচালিত কাজের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে। কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আলোচনা করলে এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ধারণাটি পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ, স্লুইস, পোল্ডার ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। দেশের সরকার ও বিদেশী দাতাসংস্থার উদ্যোগে এই অবকাঠামোগুলো তৈরীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বন্যা থেকে জনবসতি এবং কৃষি জমিকে রক্ষা করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই বন্যা রক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনামতো কাজ করেনি। ত্রুটিপূর্ণ বাঁধের ভাঙনের ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব এলাকা 'রক্ষিত' থাকার কথা ছিলো সেরকম জায়গাতেই বানের জল ঢুকেছে– ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরের বাঁধ (Brahmaputra Right Embankment) (আদনান ১৯৯১)। অথবা স্লুইসের সমস্যার জন্য জলপ্রবাহ অচল হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা (আদনান ১৯৯১: ৬২-৭২)। ১৯৯০ এর দশকে বিল ডাকাতিয়ার পোল্ডারে সারা বছর ধরে পানি জমা এরকম অপরিকল্পিত ও ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত (আদনান ১৯৯১; ২০১৬খ)। এ সব বন্যাকবলিত কিংবা জলাবদ্ধতায় আটকে যাওয়া জনগোষ্ঠী অভাবের তাড়নায় তাদের জমি জমা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে নিতান্ত বাঁচার তাগিদেই। এধরনের জমি গ্রাসের ক্ষেত্রে কোনো দখলদারের বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি (ফেল্ডম্যান ও গেইসলার ২০১২; আদনান ২০১৬খ)। যদিও বন্যাকবলিত মানুষ অভাবের তাড়নায় জমি থেকে উৎপাটিত হয়েছেন তা ছিলো সেসব বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। এই বন্যানিয়ন্ত্রণ কার্যকমের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ভূমি গ্রাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অনুরূপ পরোক্ষ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বহু অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ভূমি হারিয়েছে। ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে অপরিকল্পিত ভাবে পূর্বেকার খাল, নর্দমা ও জলনিষ্কাশন পথগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে এসব এলাকার ভূমি মালিকেরা তাদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে (আদনান ১৯৯১: ৭৩-৭৫; গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১২)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডেভেলপার কোম্পানী এবং ফটকাবাজেরাই এ ধরনের জলাবদ্ধ জমি কিনে তার সংস্কার করে পরবর্তীতে প্রচুর মুনাফা সহকারে অন্যদের কাছে তা বিক্রি করেছে।

ভূমিগ্রাসের কোনো সচেতন বা পূর্বতন উদ্দেশ্য না থাকলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট এ ধরনের অভাবের কারণেও বির্পযয় ঘটে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবিকার সংকট সৃষ্টি হয়। এসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে এলাকাবাসী মানুষকে শেষ সম্বল হিসেবে তাদের ভিটামাটি ও জমিজমা বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হয় (`distress sale') (আদনান ২০১৬ক; ২০১৬খ)।

৭। উপসংহার ও পরবর্তী আলোচ্যসূচী

ওপরের আলোচনায় বাংলাদেশে চলমান বহুমুখী ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া ও কলাকৌশলের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে শক্তির ব্যবহার থাকা বা না থাকা, অন্যদিকে প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ, এই বৈশিষ্টগুলো সমন্বিত করে চার ধরনের ভূমি দখল প্রক্রিয়ার একটি প্রাথমিক ছক তৈরী করা হয়েছে। এবং বাস্তব দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সেগুলোর পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই কয়েকটি ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: ১. প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগসহ; ২. পরোক্ষ বলপ্রয়োগসহ; ৩. প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়া; এবং ৪. পরোক্ষ বলপ্রয়োগ ছাড়া।

এই মোটা দাগের প্রকারভেদের (typology) প্রতিটি প্রক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিভাজন করা যায় কোনো বিশেষ ঘটনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ওপরের আলোচনায় প্রত্যক্ষ বলপ্রয়োগের

পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কায়দা ও ভূমিকার তফাৎ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

তবে বলা দরকার যে যদিও ওপরের বিশ্লেষণে এক এক ধরনের ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই এরকম কয়েকটি পদ্ধতি একইসাথে জমি দখলের জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানও জড়িত থাকে যেগুলোকে সমন্বিত করে প্রধান দখলকারী শক্তি বা সংস্থা। ভূমি বেদখলের আরও জটিল ঘটনাগুলিতে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করে। সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র, বাঁশখালির বিদ্যুৎকেন্দ্র, এবং গোবিন্দগঞ্জে আখ চাষের জমি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করা, এ ধরনের বহুমাত্রিক (multi-dimensional) ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার নিদর্শন। ভূমি দখলের এসব জটিল দৃষ্টান্ত পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আশা রাখি।

মনে রাখা দরকার যে ভূমিগ্রাস বা বেদখল সবক্ষেত্রে বিনা বাধায় ঘটতে পারে না। বাস্তবে, এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (resistance) ও সংগ্রামের (struggle) উদ্ভব ঘটে। যেসব জনগোষ্ঠী বা শ্রেণীর জমি গ্রাস করা হয়, কিংবা যাদের জমি হারানোর আশঙ্কা থাকে, তারা নিজেদের জায়গা রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এসব ক্ষেত্রে দখলদার এবং প্রতিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সরাসরি সহিংস সংঘাত ছাড়াও দরকষাকষি (negotiations), সালিশী (arbitration), আদালতে মামলা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপোষ করা, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া ও পরিণতি ঘটতে পারে।

ভূমি সংঘাতে লিপ্ত প্রতিটি পক্ষই নিজেদের অবস্থানকে সঠিক বলে ঘোষণা করে এবং নিজস্ব দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী ভূমি অধিকারের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য বৈধতা (legitimacy) স্থাপনের সংগ্রামও চলে। এ কারণে ভূমি অধিকার নিয়ে সংগ্রামের (struggle) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও মতাদর্শিক (ideological) লড়াইয়ের মাত্রাও (dimension) তাই কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ভূমিগ্রাসের এই বিভিন্ন আঙ্গিনার (arena) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণের ছকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

ওপরের আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যথা, নির্বাহী প্রশাসন (executive), আইনসভা (legislature), এবং বিচারব্যবস্থা (judiciary) কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিতে পারে (আদনান ২০১৩; ১১৪-১১৫; ২০১৪: ১৭)। এছাড়া, রাষ্ট্র, সমাজ ও শ্রেণীবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সার্বিক ক্ষমতা কাঠামো (power structure), ভূমিগ্রাসের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব অন্যতম নির্ণায়ক (determinant) ভূমিকা পালন করে থাকে (আদনান ২০১৩: ১১৮)। সোজা ভাষায়, যার রাজনৈতিক ও সামাজিক জোর বেশি, জমি দখলের ক্ষেত্রে তার সফল হবার সম্ভাবনাও অধিক।

সবশেষে, বলা দরকার যে ভূমিগ্রাস প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য একটি সুযোগ্য তাত্ত্বিক কাঠামোর (theoretical framework) প্রয়োজনীয়তা ওপরের আলোচনার পরিপেক্ষিতেই উঠে এসেছে। যখন একটি পুঁজিবাদী সংস্থার (capitalist enterprise) জমি অনুরূপ আরেকটি সংস্থা দখল করে তখন এই ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া পুঁজিবাদী ধনার্জনের (capitalist accumulation) কেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ার (centralization of capital) আওতায় পড়ে (মার্ক্স ১৯৭৬: ৭৭৭-৮০০)। এটা থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন হচ্ছে সেই সব প্রক্রিয়া যেখানে একটি প্রাক-পুঁজিবাদী (pre-capitalist) বা অ-পুঁজিবাদী (non-capitalist) সংস্থার জমি বেদখল হওয়ার পর কোনো পুঁজিবাদী সংস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের জমি হস্তান্তরকে আদি ধনার্জন (primitive accumulation) প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করা যায় (মার্ক্স ৯৭৬: ৮৭৩-৮৯৫)। নয়াউদারবাদী বিশ্বায়নের ছকে হার্ভে এ ধরনের ভূমিগ্রাসকে 'বেদখলের মাধ্যমে ধনার্জন' (Accumlation by dispossession) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া, ভূমি এ জন্যেও দখল করা হতে পারে যাতে বর্গাদারকে দিয়ে সেই জমি চাষ করিয়ে প্রাক-পুঁজিবাদী খাজনা (pre-capitalist rent) আদায় করা যায়। এ ধরনের ভূমিগ্রাস পুঁজিবাদী বা আদি ধনার্জন কোনোটারই অংশ নয়। কাজেই, যে কোন বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গেলে এ ধরনের গুণগতভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোকে সনাক্ত এবং পৃথক করা একান্ত আবশ্যক।

বর্তমান প্রবন্ধে উপরোক্ত তাত্ত্বিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা গেল না সময় এবং জায়গার অভাবে। তবে পরবর্তী লেখায় ভূমি দখলের এসব তাত্ত্বিক (theoretical) ও তথ্যভিত্তিক (empirical) দিকগুলি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনার আশা রাখি।

স্বপন আদনান: গবেষক
ইমেইল: amsa127@gmail.com

টীকা:

১। এসব বিদ্যমান আইনের বদলে ভূমি অধিগ্রণের জন্য একটা নতুন এবং 'আধুনায়কিত' বিধি প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এর সম্ভাব্য শিরোনাম হবে: 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭'।

২। সবক্ষেত্রে "ethnic belonging and nationalist exclusion are justifications for land grabs by the state" (গার্ডনার ও গেরহার্জ ২০১৬: ১১)।

৩। এইসব আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছে: The Defense of Pakistan Ordinance; The Enemy Property (Custody and Registration) Order of 1965 and 1966; The East Palistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1966; The Bangladesh (Vesting of Propety and Assets) Order of 1972 (ফেল্ডম্যান ২০১৬: ৮-১০; ALRD ২০১৫).

৪। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আইনের মধ্যে রয়েছে: The Restoration of Vested Property Act 2001; The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision) (Repeal) Act of 1974; The Vested Property Repeal (Amendment) Act, 2011.

৫। অবশ্য বাস্তবে এসব জমি 'কেনা' বা 'ভাড়া' নেওয়ার সময় কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়েছিলো কিনা তা উক্ত উদ্বৃত সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়নি। আমাদের পক্ষেও সকল ক্ষেত্রে এরকম দাবিদাওয়া সরেজমিনে পরখ করা সম্ভব হয়নি।

তথ্যসূত্র

আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য ২০১৪। [আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও অন্যান্য: ASK, NK, ALRD, TIB, Bangladesh Adivasi Forum, BLAST, BELA, and BAPA] আইনবিধি, মানবাধিকার ও জনস্বার্থকে উপেক্ষা করে কৃষিজমি, বনভূমি, দখল, অধিগ্রহন ও বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন। ১৩ ই নভেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রেস কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তব্য।

আদনান, স্বপন ১৯৯১ [Adnan, Shapan] Floods, People and the Environment: Institutional Aspects of Flood Protection Programmes in Bangladesh, 1990. Dhaka, Research and Advisory Services (RAS).

আদনান, স্বপন ২০০৪ [Adnan, Shapan] Migration, Land Alienation and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the

Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Dhaka: Research and Advisory Services.

আদনান, স্বপন ২০১৩ [Adnan, Shapan]'Land grabs and primitive accumulation in deltaic Bangladesh: interactions between neoliberal globalization, state interventions, power relations and peasant resistance'. The Journal of Peasant Studies, 40:1, 87-128.

আদনান, স্বপন ২০১৪ । [Adnan, Shapan] Primitive accumulation and the transition to capitalism' in neoliberal India: Mechanisms, resistance, and the presistence of self-employed labour', Chapter 2 in Barbara Harriss-White and Judith Heyer (eds,) Indian Capitalism in Development, London: Routledge, pp. 23-45.

আদনান, স্বপন ২০১৬ক । [Adnan, Shapan].'Alienation in Neoliberal India and Bangladesh: Diversity of Mechanisms and Theoretical Implications'. South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online], 13. Online since 06 April 2016, connection on 22 April 2016. URL: http://samaj.revues.org/4130

আদনান, স্বপন ২০১৬খ । বিল ডাকাতিয়ার গণ আন্দোলন' । সর্বজনকথা ৩:৯, নভেম্বর পৃ ৬৫-৭০) ।

আদনান, স্বপন ও আহসান হাবিব মনসুর ১৯৭৭ । [Adnan, Shapan and Ahsan Habib Mansoor] Land Power and Violence in Barisal Villages, Policical Economy 2(1) 125-143.

আদনান, স্বপন এবং অন্যান্য ১৯৯২ । [Adnan, S., A. Barrett, S.M.N. Alam, A. Brustinow, Aminur Rahman and Abu M. Sufiyan]. People's Participation, NGOs, and the Flood Action Plan. Dhaka: Research and Advisory Services and Oxfam-Bangladesh.

আদনান, স্বপন ও রণজিৎ দস্তিদার ২০১১ [Adnan, Shapan and Ranajit Dastidar] Alienation of the Lands of Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Dhaka: Chittagong Hill Tracts Commission and Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Ahmed 2013 Sarbojankatha [To be located and inserted]

আহাসান, আবু ও কেটি গার্ডনার ২০১৬ । [Ahasan, Abu and Katy Gardner] 'Dispossession by Development': Corporations, Elites and NGOs in Bangladesh, South Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online,] 13 2016, Online Since 13 April 2016, URL: http://samaj-revues. org/4136.

ইটন, রিচার্ড ১৯৯৭ । [Eaton, R.M]. The rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. Delhi: Oxford University Press.

এ্যান্ডারসন, বেনেডিক্ট ২০০৬ । [Anderson, Benedict] Imagined Communities. London: Verso.

ওয়াকার, ক্যাথি লে মন্স ২০০৮ । [Walker, Kathy Le Mons] Neoliberalism on the ground in rural India: Predatory growth, agrarian crisis, internal colonization, and the intensification of class struggle. Journal of Peasant Studies, 35 (4), 557-620.

খান, মোহাম্মদ তানজিমউদ্দিন ২০১৫ । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্পের নিরাপত্তকারণ । সর্বজনকথা ১:৪, আগষ্ট, পৃ ২৫-২৭ ।

গার্ডনার, কেটি ২০১২ । [Gardner Katy] Discordant Development: Capitalism and the Struggle for Connection in Bangladesh, London: Pluto Press.

গার্ডনার, কেটি ও ইভা গেরহার্জ ২০১৫ । [Gardner, Katy and Eva Gerharz] 'Land Development and Security in Bangladesh and India: An Introduction.' South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online], 13/ 2016, online since 15 March 2016. URL"http:\\samaj.revues.org/ 4141.

গার্ডনার, কেটি, জহির আহমেদ, মোহাম্মদ মাসুদ রানা ও ফাতেমা বাশার ২০১৫ । [Gardner, Katy, Zahir Ahmed, Mohammad Masud Rana and Fatema Bashar] 'Field of Dreams: Imagining Development and Un-Development at a Gas Field in Sylhet' South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online], 9. URL: http:\ samaj.revues.org\ 3741.

গৌতম, দীপংকর ২০১৫ । ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর সংগঠিত মামলা: ছয় মাসের প্রতিবেদন । সর্বজনকথা ১:২, ফেব্রুয়ারী, পৃ ৭৫-৮২ ।

ডে উইল্ড, কে ২০১১ । [de Wilde, K., ed.]. Moving coastlines: Emergence and use of land in the Ganges–Meghna– Brahmaputra Estuary. Dhaka: University Press.

পাপরকী, কাশ্যা ও জেসন কন্স ২০১৪ । [Paprocki, Kasia and Jason Cons]. 'Toward a political geography of food sovereignty: Transforming territory, exchange and power in the liberal sovereign state. Journal of Peasant Studies, 41:6.

ফেয়ারহেড, জেমস, মেলিসা লীচ্ ও ইয়ান স্কুনস্ । [Fairhead, James, Melissa Leach and Ian Scoones] 'Green Grabbing: A new contemporary of nature?' Journal of Peasant Studies, 39:2, 237-261.

ফেল্ডম্যান শেলী, ২০১৬ । [Feldman, Shelley] 'The Hindus as Other: State, Law, and Land Relations in Contemporary Bangladesh'. South Asia Multidisciplinary Academic Journal [online],13/2016, online since 08 March 2016, URL:http://s-amaj.revues.org/4111.

বড়ুয়া, জ্যোতির্ময় ব্যারিষ্টার (সম্পাদক) ২০১৩ । [Barua, Jyotirmoy Barrister (ed.)] রামু: সম্প্রদায়িক সহিংসতা সংকলন । ঢাকা: ড্রিক ।

বারকাত, আবুল ও প্রশান্ত কে, রায় ২০০৪ । [Barkat, Abul and Prosanta K. Roy] Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A case of colossal national wastage. Dhaka: Association of Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

ভাদুড়ী, অমিত ২০০৮ । [Bhaduri, Amit] Predatory growth. Economic and Political Weekly, 43: 16, pp.10-14. (19 April)

মার্ক্স, কার্ল ১৯৭৬ । [Marx, Karl] Capital: Acritique of policical economy. Volume 1. London: Penguin.

মির্জা, মাহা ২০১৫ । [Mirza, Maha] বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল: ভারতের অভিজ্ঞতার একটি স্ন্যাপশট । সর্বজনকথা, ১:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫ ।

মুহাম্মদ, আনু ২০১৬ । [Muhammad, Anu] 'ফুলবাড়ীর গল্প' । সর্বজনকথা ২:৪, আগষ্ট, পৃষ্ঠা ৩২-৪৫ ।

মোহসীন, আমেনা ১৯৯৭ । [Mohsin, Amena] The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Dhaka: University Press Limited.

রহমান, মওদুদ ২০১৬ [Rahman, Mowdud] 'বাঁশখালির সাইরেন' । সর্বজনকথা ২:৪, আগষ্ট, পৃ ২২-২৪ ।

রায়, রাজা দেবাশীষ ১৯৯৫ । [Roy, Raja Devasish]Land Rights, Land Use and Indigenous Peoples in the CHT,' in Philip Gain (ed). Bangladesh: Land, Forest and Forest People.Dhaka: Society for Environment and Human Development (SEHD).

লেভিয়েন, মাইকেল ২০১২ । [Levien, Michael] 'The land question: Special economic zones and the political economy of dispossession in India.' The Journal of Peasant Studies, 39: 3-4, 933-969.

সর্বজনকথা,২০১৪ । [Sarbojankatha] 'আদিবাসী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কীর ওপর বর্বর নির্যাতন: ভূমি দস্যুতা এবং নারী নির্যাতন যেখানে একাকার' । সর্বজনকথা ১:১, নভেম্বর, পৃ ৫-৬ ।

সর্বজনকথা, ২০১৫ । [Sarbojankatha] 'ভূমি আগ্রাসনের চিত্র' । সর্বজনকথা ১:২ ফেব্রুয়ারী, পৃ ৭-৮ ।

সর্বজনকথা, ২০০৮ । [Sarbojankatha] 'সুন্দরবন ঘিরে ১৫০ শিল্প প্রকল্প' । সর্বজনকথা, ৩:১, নভেম্বর, পৃ ৪ ।

সাম্পাত, প্রীতি ২০০৮ । [Sampat, Preeti] 'Special Economic Zones in India,' Economic and Political Weekly, 43:28, 25-29, 12 July.

সোবহান, রেহমান ২০০৭ । [Sobhan, Rehman]. The political economy of malgovernance in Bangladesh: Collected works of Rehman Sobhan, Volume 3. Dhaka: Centre for Policy Dialogue.

হার্ভে, ডেভিড ২০০৫ । [Harvey, David] The New Imperialism. Oxford; Oxford University Press.